



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 718 - 727

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

‘গীতাঞ্জলি’-র নেপালি অনুবাদ প্রসঙ্গে

ড. সূর্য লামা

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: suryalama@nbu.ac.in



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

অনুবাদ, অন্তর্ভাষিক
অনুবাদ, গীতাঞ্জলি,
অনুবাদচর্চা,
আন্তঃসাংস্কৃতিক
সংযোগ, নেপালি
সাহিত্য, দেবনাগরী
লিপি, আধ্যাত্মিক কাব্য,
তুলনামূলক সাহিত্য।

Abstract

ভারতবর্ষে অনুবাদচর্চার একটি সুদীর্ঘ ও সুপ্রাচীন ঐতিহ্য বিদ্যমান, যা ভাষা ও সংস্কৃতির পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে বহুভাষিক সমাজকে সংযুক্ত করেছে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে অন্তর্ভাষিক ও আন্তর্ভাষিক অনুবাদের নিদর্শন পাওয়া যায়, যা পরবর্তী সাহিত্যচর্চার ভিত্তি নির্মাণ করেছে। এই অনুবাদ-পরম্পরার ধারাবাহিকতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভ করে, বিশেষত গীতাঞ্জলি ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করে। নেপালি সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রধানত পরোক্ষ হলেও তা সুস্পষ্ট ও তাৎপর্যপূর্ণ। দেবনাগরী লিপির সাদৃশ্য এবং হিন্দি অনুবাদের মধ্যস্থতায় রবীন্দ্র-সাহিত্য নেপালিভাষীদের কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। ১৯৩৬ সাল থেকে নেপালি ভাষায় গীতাঞ্জলি-র একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়, যা নেপালি সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের ভাব ও কাব্যদর্শনের বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই প্রবন্ধে বাংলা গীতাঞ্জলি এবং তার নেপালি অনূদিত পাঠের তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা গেছে যে, অনুবাদকরা মূল কবিতার আধ্যাত্মিকতা, আবেগ ও ভাবগত গভীরতা বজায় রাখার পাশাপাশি সৃজনশীল পুনর্নির্মাণের পথ অনুসরণ করেছেন। ফলে নেপালি অনুবাদগুলি উৎস পাঠের অনুকরণে সীমাবদ্ধ না থেকে স্বতন্ত্র কাব্যিক সত্তা অর্জন করেছে। সার্বিকভাবে বলা যায়, নেপালি ভাষায় গীতাঞ্জলি-র অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনার আন্তঃসাংস্কৃতিক সম্প্রসারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যা অনুবাদকে কেবল ভাষান্তর নয়, বরং সৃজনশীল সাংস্কৃতিক সংলাপ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

Discussion

ভারতবর্ষের মতো ভাষাবৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে অনুবাদচর্চার বড়ো পরিসর রয়েছে। বৈচিত্র্যের মধ্যে একের ভাবকে ধরে রাখতে গেলে এ-দেশে ভাষার সঙ্গে ভাষার বিনিময় আরও অনিবার্য হয়ে পড়ে। বলাবাহুল্য, অনুবাদের মধ্যে দিয়ে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের মানুষের আচার-অনুষ্ঠান, জীবনযাপনের রীতি-পদ্ধতি, তাদের মূল সংস্কৃতিকেও উপলব্ধি করা যায়। অনুবাদ বলতে শুধু আগাগোড়া যথাযথ হুবহু অনুকরণকে বলা যায় না। উদ্দিষ্ট পাঠ যখন উৎস পাঠকে কালের মাত্রায় ব্যঞ্জিত করে; উৎস

পাঠ যখন নব নব ভাব নিয়ে আমাদের সামনে প্রকটিত হয়; তখন সেই অনুবাদকে সার্থক হিসেবে ধরে নিতে পারি।
প্রসঙ্গত, বলা যায়—

“অনুবাদকে দর্পণে প্রতিবিম্বিত অনুকৃতি সত্ত্বা না বলে যখন বিচ্ছুরিত পুনঃপাঠ বলি, তখন বিচ্ছুরণ হয়ে
ওঠে পর্যবেক্ষণের এবং পরিবর্তনের সূচক। তাই কোনো পাঠকৃতি যখন সময় ও পরিসরের ব্যবধান
পেরিয়ে এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতিতে সঞ্চারিত হয়, গড়ে ওঠে পুরোপুরি নতুন জগৎ।”^১

অনুবাদের মধ্যে দিয়ে শুধু যে-ভাষার পরিবর্তন হচ্ছে তা কিন্তু নয়। উৎস পাঠ থেকে উদ্ভিষ্ট পাঠে পুনর্নির্মিত হতে গিয়ে
মূল ভাব, ভাষাগত ভিত্তি, সংরূপ, দর্শনেরও আমূল পরিবর্তন ঘটে। এই কারণে জাক দেরিদার কাছে অনুবাদ এক মৌলিক
সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ-প্রসঙ্গে বলেছেন—

“ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষায় প্রকাশের প্রথা স্বতন্ত্র এবং পরস্পরের মধ্যে শব্দ ও প্রতিশব্দের অবিকল
মিল পাওয়া অসম্ভব, এই কথাটি তর্জমা করতে গিয়ে যতই আমাদের কাছে ধরা পড়ে ততই উভয়
ভাষার প্রকৃতি স্পষ্ট করে বুঝতে পারি। এই জন্যে অনুবাদের যোগে বিদেশী ভাষাশিক্ষার প্রণালীকে
আমি প্রশস্ত বলে মনে করি।”^২

১

বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে অনুবাদচর্চার একটি সুস্পষ্ট ঐতিহ্য লক্ষণীয়। গুণাঢ্যের *বৃহৎকথা* (খ্রিস্টীয় দ্বিতীয়-চতুর্থ
শতক) অবলম্বনে রচিত সংস্কৃত সাহিত্য এই অনুবাদ-পরম্পরার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। এই ধারার অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থগুলির
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— বুদ্ধস্বামিনের *বৃহৎকথাক্সোক্তসংগ্রহ* (খ্রিস্টীয় নবম শতক), ক্ষেমেন্দ্রের *বৃহৎকথামঞ্জরী* (একাদশ
শতক), সোমদেবের *কথাসরিৎসাগর* এবং নারায়ণের *হিতোপদেশ* (নবম-দশম শতাব্দী)। লৌকিক সংস্কৃত নাটকে পুরুষ
চরিত্রেরা সাধারণত সংস্কৃত ভাষায় সংলাপ ব্যবহার করত, অপরদিকে নারী ও নিম্ন সম্প্রদায়ের চরিত্রদের সংলাপ প্রাকৃত
ভাষায় রচিত হতো। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল— এই প্রাকৃত সংলাপগুলির সঙ্গে সংস্কৃত অনুবাদ সংযোজিত থাকত, যা
‘ছায়া’ নামে পরিচিত। এই ধরনের অনুবাদকে অন্তর্ভাষিক অনুবাদ (intralingual translation) হিসেবে চিহ্নিত করা
যেতে পারে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন –

“গীতাঞ্জলি ১৩১৭ সালের পূর্জার পূর্বে প্রকাশিত হইল (১৯১০ সেপ্টেম্বর)। এই কাব্যে মোট ১৫৭টি গান
ও কবিতা আছে।”^৩

এই গ্রন্থের আদিপর্বের গানগুলি হল বর্ষাসংগীতের অন্তর্গত। এই গীতিধারায় দেবতা, প্রকৃতি ও মানুষের যে-অবিচ্ছেদ্য
সম্পর্কের সুর শোনা যায়, তার সঙ্গে সুন্দরের আবহ রবীন্দ্র-সাহিত্যে পেয়েছে এক অনন্য রূপ। এই পর্ব থেকেই আধ্যাত্মিক
সংগীতের (spiritual as opposed to religious) সূত্রপাত। বিখ্যাত কলাশাস্ত্রী আনন্দ কুমার স্বামীসহ সহযোগিতায় ১৯১১
সালে রবীন্দ্র-কবিতার ইংরেজি অনুবাদ মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই তালিকায় রয়েছে *শিশু*, *ভোলানাথ*, *বিদায়*
-এর মতো কবিতা। ১৯১০ সালে এই পত্রিকায় ক্ষুধিত *পাষাণ*-এর ইংরেজি অনুবাদ *Hungry Stones* প্রকাশিত হয়।
মর্ডান রিভিউ পত্রিকায় ১৯১১ সাল থেকে যদুনাথ সরকারের উদ্যোগে রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ পেতে
থাকে। ১৯১২ সালে এই পত্রিকায় ভগিনী নিবেদিতা অনূদিত *কাবুলিওয়ালা* পড়ে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী রোদেনস্টাইন মুগ্ধ হন।
ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মাধ্যমে তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য পান এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে প্রকাশ
করেন। এ-প্রসঙ্গে জানা যায়—

“ব্রজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে বিলাতে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে বিলাতে তাঁহারই
মনের মতো কয়েকটি হৃদয় তাঁহার অপেক্ষায় আছে।”^৪

এই সময় শিলাইদহে থাকাকালীন অবসর সময়ে গীতাঞ্জলি অনুবাদে হাত দেন। ব্রজেন্দ্রনাথের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি একান্ন বছর বয়সে তৃতীয়বার বিলেত যাত্রা করেন। শিলাইদহে এবং বিদেশে যাওয়ার পথে জাহাজে অনূদিত কবিতা নিয়ে বিলেতে পাড়ি দেন। কবির অনূদিত পাণ্ডুলিপি রোদেনস্টাইনের বাড়িতে এক ঘরোয়া বৈঠকে পড়া হয়।

“লন্ডনে পৌঁছিয়া তিনি রোদেনস্টাইনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন ও গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার হাতে একখানি ছোটো নোট বহি দিলেন, উহাতে কবির নিজকৃত অনুবাদ ছিল। ইহাই ইংরেজি গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি, রোদেনস্টাইনকে উৎসর্গীত।”^৫

এরপরের ঘটনা তো আমাদের সকলেরই জানা, ইন্ডিয়া সোসাইটি অব লন্ডন কর্তৃক প্রকাশিত ইয়েটসের ভূমিকা-সংবলিত গীতাঞ্জলি-র ইংরেজি সংস্করণের মাধ্যমে কবি সারা বিশ্বে পরিচিত হন।

নেপালি সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে কবির প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল কিনা তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। রবীন্দ্র-জীবনী প্রথম খণ্ড থেকে আমরা জানতে পারি, ১৮৯৬ সালে উড়িষ্যা ভ্রমণকালে কবি অনেক বই সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। এই সব বইয়ের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *Sanskrit Buddhist literature of Nepal* গ্রন্থটি অন্যতম। ১৯২২ সালে ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ সবে শিলাইদহ থেকে ফিরে এসেছেন, তাই গ্রীষ্মকালে তিনি শান্তিনিকেতনেই কাটাবেন বলে স্থির করেছেন। শরীর যদি ঠিক থাকত তাহলে হয়তো তিনি সে-বারে সিলভা লেভি সঙ্গে নেপাল যেতেন—

“লেভি সাহেব এখন নেপালে আনন্দে আছেন। আমি গ্রীষ্মবকাশ এইখানেই যাপন করবার সঙ্কল্প করেছি।”^৬

রাণা বংশের (শাসনকাল ১৮৫০-৯০) সন্তান বালকৃষ্ণ সামশের জংবাহাদুর রাণা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী। তাঁর আঁকা ছবি রয়াল নেপাল আর্ট গ্যালারীতে সংরক্ষিত আছে। ধরনীধর শর্মা (১৮৯৩-১৯৮০) হলেন সে-ই কবি যাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল। নেপালে জন্ম হলেও পড়াশোনা বেনারস, কলকাতা এবং ঢাকায়। পেশায় শিক্ষক ধরনীধর কৈরালী ১৯১৯ সাল থেকে দার্জিলিঙে কাটিয়েছেন। কুমার প্রধানের মতে,

“মদনমোহন মালব্য, স্যার যদুনাথ সরকার, আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মণীষীর সাহচর্যধন্য ধরনীধর আপন সম্প্রদায়ের মানুষের উন্নতির জন্য সারা জীবন সচেষ্ট ছিলেন।”^৭

১৯২৪ সালে ২৫ মে দার্জিলিঙে নেপালি সাহিত্য সম্মেলনের সূচনা হয়। রবীন্দ্রনাথ এই সাহিত্য সম্মেলনকে সাধুবাদও জানিয়েছিলেন—

“You ‘have my heartiest sympathy in your endeavour so make Nepali language fruitful in her literature.”^৮

এরপর আসা যাক লক্ষ্মীপ্রসাদ দেওকোটায়। বহুভাষাবিদ দেওকোটার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতন যাওয়ার পথে ট্রেনের কামরায় কবিগুরুর সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়। ইন্দ্ৰবিলাস অধিকারী তাঁর ‘A Comparative Study of Laxmi Prasad Devkota and the English Romantic Poets of the Nineteenth Century’ গবেষণা-সন্দর্ভে বলেছেন—

“Some of the critics of Devkota’s poetry discerned Rabindranath Tagore’s influence on him.”^৯

প্রসঙ্গত স্বীকার করতে অসুবিধা নেই, দেওকোটার অনেক কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব স্পষ্ট। তবে এখানে সেই কবিতাগুলি আলোচনার করার সুযোগ নেই।

২

ভারতীয় নেপালি সম্প্রদায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয় মূলত দার্জিলিং, কালিম্পং, কাশ্মিরাং, তিনধরিয়া ও মংপুতে তাঁর ভ্রমণের সূত্রে। এই অঞ্চলগুলিতে অবস্থানকালে কবি স্থানীয় নেপালি সমাজ ও

সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪০ সালে কবির জন্মদিন মংপুতে অত্যন্ত সমারোহের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়েছিল, যা ভারতীয় নেপালি সমাজে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও প্রভাবের এক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়। কবি নিজেই বলেছেন—

“কালপ্রাতে মোর জন্মদিনে
এ শৈল-আতিথ্যবাসে
বুদ্ধের নেপালী ভক্ত এসেছিল মোর বার্তা শুনে
ভূতলে আসন পাতি
বুদ্ধের বন্দনামন্ত্র শুনাইল আমার কল্যাণে—
গ্রহণ করিনু সেই বাণী।”^{১০}
(৬ নম্বর, জন্মদিনে)

মংপুর প্রবীণতম ব্যক্তি হরকামান লামা এই বৌদ্ধ স্তোত্র পাঠ করেছিলেন। ৭ নম্বর কবিতা থেকে জানা যায়—

“অপরাহে এসেছিল জন্মবাসরের আমন্ত্রণে
পাহাড়িয়া যত।
একে একে দিল মোরে পুষ্পের মঞ্জুরি
নমস্কারসহ।”^{১১}
(৭ নম্বর, জন্মদিনে)

কবির জন্মদিন উপলক্ষে নেপালি ভক্তদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের ঘটনাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংশ্লিষ্ট বছরে মংপুতে কবির জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হলে নেপাল মজুমদার এই আয়োজনকে ‘জনগণের রবীন্দ্র জন্মোৎসব’ বলে অভিহিত করেন, যা নেপালি জনগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও আবেগপূর্ণ সংযোগের ইঙ্গিত বহন করে। এছাড়া তিনধরিয়ায় কবি প্রমথ চৌধুরীর ভ্রাতা আশুতোষ চৌধুরীর বাসভবন ‘শান্তাভবনে’ রবীন্দ্রনাথ প্রায় কুড়ি দিন অবস্থান করেন। এই সময়পর্বে তিনি *গীতাঞ্জলি*-র একাধিক গান ও কবিতা রচনা করেন, যেগুলিতে প্রকৃতি, অন্তর্লীন আত্মসংলাপ এবং আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের গভীর সুর প্রতিফলিত হয়েছে। এই পর্যায়ে রচিত—

“ঐ রে তরী দিল খুলে।
তোর বোঝা কে নেবে তুলে।
সামনে যখন যাবি ওরে
থাক্ না পিছন পিছে পড়ে,
পিঠে তারে বইতে গেলি
একলা পড়ে রইলি কূলে। (৬৯, গীতাঞ্জলি)

চিত্ত আমার হারালো আজ
মেঘের মাঝখানে,
কোথায় ছুটে চলেছে সে
কোথায় কে জানে।” (৭০, গীতাঞ্জলি)

“ওগো মৌন, না যদি কও
নাই কহিলে কথা।
বক্ষ ভরি বইব আমি

তোমার নীরবতা।” (৭১, গীতাঞ্জলি)

“যতবার আলো জ্বালাতে চাই
নিবে যায় বারে বারে।
আমার জীবনে তোমার আসন
গভীর অন্ধকারে।” (৭২, গীতাঞ্জলি)

অনেক নেপালি ছাত্র বিভিন্ন সময়ে শান্তিনিকেতনে এসে পড়াশোনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠিপত্র, শান্তাদেবীর প্রবন্ধ *রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন* এবং অমিতাভ চৌধুরীর *একত্রে রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থ থেকে নেপালি ছাত্রদের শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এই সূত্রগুলি থেকে জানা যায় যে, নেপালের বহু শিক্ষার্থী শান্তিনিকেতনের শিক্ষাদর্শ ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই তালিকায় উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন— পারশমণি প্রধানের ভ্রাতা শেষমণি প্রধান (কলাভবনের ছাত্র), নরভূপ রাই এবং বিজয়প্রসাদ কৈরাল। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, শেষমণি প্রধান দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট রবীন্দ্রসংগীতের তালিম গ্রহণ করেছিলেন। এর মাধ্যমে শান্তিনিকেতনের সংগীতচর্চা ও নেপালি শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক সংযোগের একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক উন্মোচিত হয়।

৩

নেপালি সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব প্রধানত পরোক্ষ বলেই বিবেচিত হয়। হিন্দি ও নেপালি—উভয় ভাষাই দেবনাগরী লিপিতে রচিত হওয়ায় লিপিক্রমে সাদৃশ্যের সূত্রে রবীন্দ্র-সাহিত্যের হিন্দি অনুবাদ নেপালিভাষী পাঠকদের কাছে সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। বলাবাহুল্য, নেপালি ভাষায় কবির প্রথম অনূদিত গ্রন্থ *গীতাঞ্জলি* প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। এই অনুবাদকর্মটি সম্পাদন করেন লক্ষ্মীপ্রসাদ দেওকোটীর বন্ধু শঙ্করদেব পণ্ডা। পরবর্তীকালে জাপানি পর্যটক ওকিওয়ামা গোয়াইন নেপালি এক নারীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সারাজীবন দার্জিলিঙে বসবাস করেন। রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে জানার আকাঙ্ক্ষায় তিনি বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন এবং ১৯৩৯ সালে নেপালি ভাষায় *গীতাঞ্জলি*-র অনুবাদ সম্পন্ন করেন। এরপর ১৯৬৫ সালে লোকেশচন্দ্র প্রধান *গীতাঞ্জলি* অনুবাদ করেন। ১৯৬১ সালে মাধবলাল কর্মাচার্য রবীন্দ্রনাথের *জীবনস্মৃতি* নেপালি ভাষায় অনুবাদ করেন। একই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৫ সালে ঋদ্ধিবাহাদুর মল্ল *গোরা* উপন্যাসের অনুবাদ সম্পন্ন করেন। এ ছাড়া উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নেপালি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক তুলসী বাহাদুর ছেত্রী *কর্ণ-কুন্তী সংবাদ* ও *গীতাঞ্জলি* নেপালি ভাষায় অনুবাদ করেন। এই সকল অনুবাদকর্মের মাধ্যমে নেপালি ভাষা ও সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা, ভাবনা ও সাহিত্যিক প্রভাব ক্রমাগত বিস্তার লাভ করে। প্রথমে কবির মূল বাংলা রচনা ও পরে সেগুলির নেপালি অনুবাদ নীচে দেখানো হল।

১. বাংলা

“হেথা যে গান গাইতে আসা আমার
হয়নি সে গান গাওয়া—
আজও কেবলই সুর সাধা, আমার
কেবল গাইতে চাওয়া।” (৩৯ নম্বর)

নেপালি

“জুন গীত গাউনলাঈ ম যহাঁ আঁ
ত্যা গীত আজসম্ম অগেয় ছ।
মৈলে আফনা বাদ্য-উপকরণমা তার জোড়ী র
তার ছুটাঈ আফনা দিনহরু রিত্যাঁ।” (১৩ নম্বর)

বাংলা মূল পাঠ এবং অনুবাদ পরীক্ষা করলেই কয়েকটি সত্য স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। প্রথমটিতে ধ্বনিত হয়েছে অপূর্ণতার বোধ ও চিরন্তন সাধনার আকাঙ্ক্ষা। ‘গান গাইতে আসা’ সত্ত্বেও ‘সে গান গাওয়া হয়নি’ —এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কবি সৃষ্টিকে চূড়ান্ত অর্জন নয়, বরং এক নিরবচ্ছিন্ন প্রস্তুতি ও প্রত্যাশার প্রক্রিয়া হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। ‘সুর সাধা’ ও ‘গাইতে চাওয়া’ শব্দবন্ধে সংগীত এখানে আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতীক হয়ে উঠেছে। নেপালি অনুবাদে এই ভাবগত কাঠামোটি সংরক্ষিত থাকলেও প্রকাশরীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর লক্ষ করা যায়। অনুবাদক বিমূর্ত সংগীতভাবকে বাদ্য-উপকরণ, তার জোড়া ও তার খুলে দেওয়া, — এই সব দৃশ্যমান ও বস্তুগত চিত্রকল্পের মাধ্যমে রূপায়িত করেছেন। ফলে মূল কবিতার অন্তর্গত মানসিক ও আধ্যাত্মিক সাধনা নেপালি পাঠে দৈনন্দিন জীবন ও শ্রমের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এখানে অনুবাদটি শব্দানুবাদে সীমাবদ্ধ না থেকে ভাবানুবাদ বা সৃজনশীল পুনর্নির্মাণের পথ অনুসরণ করেছে। বাংলা পাঠের সংযত, ধ্যানমগ্ন সুর নেপালি অনুবাদে অধিক বিস্তৃত ও বর্ণনামুখী রূপ পেয়েছে। এর ফলে উৎস পাঠের দার্শনিক তাৎপর্য অক্ষুণ্ণ থেকেও অনুবাদটি একটি স্বতন্ত্র কাব্যিক সত্তা লাভ করেছে। সার্বিকভাবে বলা যায়, এই অনুবাদে রবীন্দ্র-কবিতার আধ্যাত্মিক অশ্বেষা নেপালি সাংস্কৃতিক পরিসরে নতুন ভাষা ও চিত্রকল্পে পুনর্গঠিত হয়েছে, যা একে সফল আন্তঃসাংস্কৃতিক অনুবাদের (intercultural translation) দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।

২. বাংলা

“তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী,
অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি।
সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে,
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে
পাষণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে
বহিয়া যায় সুরের সুরধনী” (২২ নম্বর)

নেপালি

“মেরা স্বামী! মলাঙ্গি থাहा ছৈন তিমী কসরী গাউছৌ,
ম সধৈ মৌন আশ্চর্যমা সুনুছু।
তিম্রো সঙ্গীতকো প্রকাশলে বিশ্বলাঙ্গি উজ্জ্বল বনাউছ।
তিম্রো সঙ্গীতকো জীবন-শ্বাস আকাশ-আকাশ দৌডনুছ।
তিম্রো সঙ্গীতকো পরিত্র খেলো টুঙ্গে-বাধাহরু কাটা বগ্‌দৈ জানুছ।” (৩ নম্বর)

মূল বাংলা পাঠে ‘গুণী’-র সংগীতের অলৌকিক শক্তি, বিস্ময় ও গতিময়তা রূপক-চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ‘সুরের আলো’, ‘সুরের হাওয়া’, ‘পাষণ টুটে’ —এই সব চিত্রকল্প সংগীতকে এক সর্বব্যাপী, প্রকৃতিকে আন্দোলিতকারী শক্তি হিসেবে উপস্থাপন করে। নেপালি অনুবাদে মূল ভাব অক্ষুণ্ণ থাকলেও প্রকাশভঙ্গিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর লক্ষণীয়। অনুবাদক শুরুতেই ‘মেরা স্বামী!’ সম্বোধন যুক্ত করেছেন, যা মূল বাংলায় অনুপস্থিত। এর ফলে কবি ও ‘গুণী’-র মধ্যকার সম্পর্ক এখানে আরও ব্যক্তিগত ও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এটি অনুবাদকের সাংস্কৃতিক ও আবেগগত সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। বাংলা কবিতায় যেখানে বিস্ময় প্রকাশিত হয়েছে সংযত ও নান্দনিক ভঙ্গিতে— ‘অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি’ — নেপালিতে সেখানে তা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ— ‘ম সধৈ মৌন আশ্চর্যমা সুনুছু’। একইভাবে ‘সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে’ ভাবটি নেপালিতে ব্যাখ্যামূলক বিস্তারে রূপ নিয়েছে— ‘বিশ্বলাঙ্গি উজ্জ্বল বনাউছ’। এ ছাড়া লক্ষণীয় যে, মূল কবিতায় ‘তুমি’ সর্বনামটির ব্যবহার সীমিত হলেও নেপালি অনুবাদে ‘তিমী/ তিম্রো’ শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এর ফলে সংগীত স্রষ্টার উপস্থিতি আরও জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৩. বাংলা

“মেঘের পরে মেঘ জমেছে,
আঁধার করে আসে—

আমায় কেন বসিয়ে রাখ
একা দ্বারের পাশে।” (১৬ নম্বর)

নেপালি

“বাদল বাদলমাথি রাস লাগ্ছ
র অঁধ্যারো বঢ়্দৈ জান্ছ।
এ, প্রেমী, তিমী মলাঈ ঢোকাবাহির কিন
ফগত একলো প্রতীক্ষারত রাখ্ছৌ?” (১৮ নম্বর)

মূল রচনায় প্রকৃতি ও মানবমনের একাত্মতা অত্যন্ত সংযত ও ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। ‘মেঘের পরে মেঘ জমেছে’, ‘আঁধার করে আসে’ — এই চিত্রকল্পগুলি বাহ্যিক প্রকৃতির ঘন অন্ধকারের পাশাপাশি অন্তর্মনের বিষণ্ণতা ও অপেক্ষার বেদনাকে প্রতীকী রূপ দেয়। শেষ দুই পঙ্ক্তিতে ‘আমায় কেন বসিয়ে রাখ/ একা দ্বারের পাশে’ — এই প্রশ্নে একাকিত্ব, অভিমান ও নীরব প্রত্যাশা একত্রে ধরা পড়ে। নেপালি অনুবাদে মূল আবহ অক্ষুণ্ণ থাকলেও অনুভূতির প্রকাশ আরও প্রত্যক্ষ ও সংলাপনির্ভর হয়ে উঠেছে। বাংলার ‘মেঘ’ এখানে ‘বাদল’ এবং ‘বাদলমাথি বাদল’ রূপে পুনরুক্ত হয়ে অন্ধকারের ঘনত্বকে আরও জোরালো করেছে। ‘অঁধ্যারো বঢ়্দৈ জান্ছ’ বাক্যাংশটি ক্রমবর্ধমান অন্ধকারের গতিশীলতাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যটি দেখা যায় সম্বোধন ও প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে। বাংলা কবিতায় কোনো সরাসরি সম্বোধন নেই; সেখানে বেদনা অন্তর্মুখী ও নীরব। কিন্তু নেপালি অনুবাদে অনুবাদক ‘এ, প্রেমী’ সম্বোধন যুক্ত করেছেন এবং প্রশ্নটিকে সরাসরি কথোপকথনের রূপ দিয়েছেন—‘তিমী মলাঈ ঢোকাবাহির কিন...?’ এর ফলে মূল কবিতার সংযত অভিমান নেপালিতে আরও স্পষ্ট আবেগ ও অভিযোগে রূপান্তরিত হয়েছে।

৪. বাংলা

“আজি শ্রাবণঘন-গহন-মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মতো নীরব ওহে
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।” (১৮ নম্বর)

নেপালি

“বর্ষাত্মক অসারকা ঘনঘোর ছায়াহরুমা
অদৃশ্য পাইলাহরু লিএর তিমী হিংড়্ছৌ,
রাত বৈং মৌন ভএর,
দর্শকহরুলাঈ ঝুক্যাউঁদৈ।” (২২ নম্বর)

মূল বাংলা পাঠে শ্রাবণমাসের ঘন, নিবিড় ও মোহময় আবহের মধ্যে প্রিয়ের আগমনকে রহস্যময় ও নীরব এক গতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। ‘শ্রাবণঘন-গহন-মোহে’ — এই যৌগিক শব্দবন্ধে বর্ষার ঘনত্ব, আকর্ষণ ও আবেশ একসঙ্গে ধরা পড়ে। ‘গোপন তব চরণ ফেলে’ এবং ‘সবার দিঠি এড়ায়ে এলে’ পঙ্ক্তিদ্বয়ে গোপনতা ও অন্তরঙ্গতার অনুভূতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ‘নিশার মতো নীরব’ উপমাটি আগমনকে প্রায় অলৌকিক ও স্বপ্নিল করে তোলে। নেপালি অনুবাদে মূল ভাব বজায় থাকলেও প্রকাশভঙ্গিতে ব্যাখ্যামূলক বিস্তার দেখা যায়। বাংলার সংক্ষিপ্ত ও ইঙ্গিতধর্মী ‘শ্রাবণঘন-গহন-মোহে’ নেপালিতে রূপ নিয়েছে— ‘বর্ষাত্মক অসারকা ঘনঘোর ছায়াহরুমা’, যেখানে বর্ষার পরিবেশকে দৃশ্যমান ও বর্ণনামূলক করে তোলা হয়েছে। ‘গোপন তব চরণ ফেলে’ ভাবটি ‘অদৃশ্য পাইলাহরু লিএর তিমী হিংড়্ছৌ’ বাক্যে রূপান্তরিত হয়ে গোপনতার চিত্রকে আরও স্পষ্ট করেছে। এ ছাড়া ‘নিশার মতো নীরব’ উপমাটি নেপালিতে ‘রাত বৈং মৌন ভএর’ রূপে প্রায় আক্ষরিকভাবেই উপস্থিত, যদিও এখানে নীরবতার ওপর জোর আরও প্রত্যক্ষ। শেষ পঙ্ক্তিতে ‘সবার দিঠি এড়ায়ে এলে’

ভাবটি নেপালিতে ‘দর্শকহরলাঙ্গি বুকাউঁদে’ হিসেবে প্রকাশিত হয়ে সামাজিক দৃষ্টির ফাঁকি দেওয়ার ধারণাকে স্পষ্ট করে তোলে।

৫. বাংলা

“রাজার মতো বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে,
পরাও যারে মণিরতন-হার—
খেলাধুলা আনন্দ তার সকলই যায় ঘুরে
বসন-ভূষণ হয় যে বিষম ভার।” (১২৭ নম্বর)

নেপালি

“যররাজকো আভূষণলে সুসজ্জিত র গলামা জুহারতকো সিক্রী
লগাএকো বালকলে খেলকো সবে আনন্দ হরাউঁছ; উসকো আভূষণলে
হরকদমমা উসলাঙ্গি বাধা পুরাউঁছ।” (৮ নম্বর)

বাংলা পাঠে শিশুমনের স্বাভাবিক আনন্দ ও স্বাধীনতার সঙ্গে আরোপিত আড়ম্বরের বিরোধ তুলে ধরা হয়েছে। ‘রাজার মতো বেশে’ ও ‘মণিরতন-হার’ —এই চিত্রকল্পগুলি বাহ্যিক ঐশ্বর্য ও আভিজাত্যের প্রতীক হলেও, কবি দেখিয়েছেন যে, এই অলংকার শিশুর স্বাভাবিক খেলাধুলা ও আনন্দকে বাধাগ্রস্ত করে। শেষ পঙ্ক্তিতে ‘বসন-ভূষণ হয় যে বিষম ভার’ —এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অতিরিক্ত সাজসজ্জার নেতিবাচক দিকটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। নেপালি অনুবাদে মূল বক্তব্য অক্ষুণ্ণ থাকলেও প্রকাশভঙ্গি আরও ব্যাখ্যামুখী ও প্রত্যক্ষ হয়েছে। বাংলার কাব্যিক ও ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষা নেপালিতে প্রায় গদ্যধর্মী রূপ গ্রহণ করেছে। ‘খেলাধুলা আনন্দ তার সকলই যায় ঘুরে’ ভাবটি নেপালিতে ‘খেলকো সবে আনন্দ হরাউঁছ’ হিসেবে সরাসরি ও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। একইভাবে ‘বসন-ভূষণ হয় যে বিষম ভার’ ভাবটি ‘হরকদমমা উসলাঙ্গি বাধা পুরাউঁছ।’ বাক্যে ব্যাখ্যামূলক রূপ পেয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে, বাংলা কবিতার ছন্দ ও সংগীতধর্মিতা নেপালি অনুবাদে তুলনামূলকভাবে ক্ষীণ হলেও অর্থ ও ভাবের যথাযথ সংক্রমণ ঘটেছে। অনুবাদক কাব্যিক সংকেতের পরিবর্তে অর্থের স্বচ্ছতা ও বোধগম্যতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

৬. বাংলা

“আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরানসখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশ-সম
নাই যে ঘুম নয়নে মম” (২০ নম্বর)

নেপালি

“কে তিমী আজকো যস তুফানী রাতমা আফনো মায়াকো যাত্রামা
কুনৈ অর্কো সংসারমা ছৌ, মেরা মিত্র? আকাশ হতাশ ভএর আর্তনাদ গর্দৈ ছ।
আজ রাতি মলাঙ্গি নিদ্রা লাগেন।” (২৩ নম্বর)

এখানে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি ও ব্যক্তিগত অনুভূতির এক গভীর সংলাপ নির্মাণ করেছেন। ‘ঝড়ের রাত’ কেবল একটি প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপট নয়, বরং প্রেমিকের মানসিক অস্থিরতা, উৎকর্ষ ও বিচ্ছেদের যন্ত্রণার প্রতীক। ‘তোমার অভিসার’ কথাটির মধ্য দিয়ে প্রিয়জনের গোপন যাত্রা ও তার অনিশ্চয়তা কবিকে উদ্ভিন্ন করে তোলে। ‘আকাশ কাঁদে হতাশ-সম’-এর মাধ্যমে কবির ব্যক্তিগত বেদনাই যেন প্রকৃতির কান্নায় রূপ নেয়। শেষ পঙ্ক্তিতে ‘নাই যে ঘুম নয়নে মম’ কবির অন্তর্গত অস্থিরতা ও অনিদ্রার অবস্থাকে সংক্ষিপ্ত অথচ গভীরভাবে প্রকাশ করে। নেপালি অনুবাদে এই আবেগগত কাঠামো অক্ষুণ্ণ থাকলেও প্রকাশভঙ্গিতে লক্ষণীয় রূপান্তর ঘটেছে। বাংলা কবিতার ইঙ্গিতপূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত ভাষা নেপালিতে অধিক ব্যাখ্যামুখী ও বিস্তৃত রূপ নিয়েছে। অনুবাদক ‘তোমার অভিসার’-এর ভাবকে ‘আফনো মায়াকো যাত্রা’ এবং ‘কুনৈ অর্কো সংসারমা ছৌ?’ —এই

প্রশ্নাত্মক বাক্যে রূপান্তর করেছেন, যা মূল কবিতায় অনুপস্থিত হলেও বিচ্ছেদের আশঙ্কাকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। এখানে অনুবাদক কবির নীরব আশঙ্কাকে ভাষাগতভাবে উচ্চকিত করেছেন। ‘আকাশ কাঁদে হতাশ-সম’ পঙ্ক্তিটি নেপালিতে ‘আকাশ হতাশ ভএর আর্তনাদ গর্দে ছ’ রূপে রূপান্তরিত হয়ে আরও নাটকীয় প্রকাশ পেয়েছে। একইভাবে ‘নাই যে ঘুম নয়নে মম’-এর সংক্ষিপ্ত কাব্যিক বেদনা নেপালিতে ‘আজ রাতি মলাঙ্গি নিদ্রা লাগেন’ —এই সরল ও প্রত্যক্ষ বাক্যে রূপ নিয়েছে। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, এই অনুবাদে মূল কবিতার আবেগ, বিষাদ ও উৎকণ্ঠা যথাযথভাবে সংরক্ষিত হলেও, কাব্যিক সংঘমের পরিবর্তে ব্যাখ্যা ও স্পষ্টতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

৭. বাংলা

“আমি হেথায় থাকি শুধু
গাইতে তোমার গান,
দিয়ো তোমার জগৎসভায়
এইটুকু মোর স্থান” (৩১ নম্বর)

নেপালি

“ম যহাঁ তিমীলাঙ্গি গীত সুনাইছু।
ম তিম্রো যস বিশাল দরবারকো এউটা কুনাকো আসনমা ছু।” (১৫ নম্বর)

রবীন্দ্রনাথ ভক্তি, আত্মসমর্পণ ও বিনয়ের এক গভীর অনুভব প্রকাশ করেছেন। মূল বাংলা কবিতায় কবি নিজেকে একান্তভাবে গীতগায়নকারী রূপে স্থাপন করেছেন— ‘আমি হেথায় থাকি শুধু/ গাইতে তোমার গান’। এখানে ‘থাকি’ শব্দটি স্থায়িত্ব ও আত্মনিবেদনের ইঙ্গিত বহন করে। ‘তোমার জগৎসভা’ এক মহাজাগতিক পরিসরের প্রতীক, যেখানে কবি বিনয়ের সঙ্গে কেবল ‘এইটুকু মোর স্থান’ প্রার্থনা করছেন। নেপালি অনুবাদে এই আত্মনিবেদনমূলক ভাব অক্ষুণ্ণ থাকলেও প্রকাশভঙ্গিতে কিছু রূপান্তর লক্ষণীয়। বাংলার সংক্ষিপ্ত ও সংগীতধর্মী পঙ্ক্তিগুলি নেপালিতে গদ্যধর্মী রূপ গ্রহণ করেছে। ‘আমি হেথায় থাকি শুধু’ ভাবটি নেপালিতে ‘ম যহাঁ তিমীলাঙ্গি গীত সুনাইছু’ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে ‘থাকা’-র স্থায়িত্বমূলক অর্থের পরিবর্তে ‘গীত সুনাইছু’— ক্রিয়ামুখী প্রকাশ গুরুত্ব পেয়েছে। ‘তোমার জগৎসভা’ শব্দবন্ধটি নেপালিতে ‘তিম্রো যস বিশাল দরবার’ রূপে অনূদিত হয়েছে। এখানে ‘জগৎসভা’-র আধ্যাত্মিক ও বিশ্বজনীন পরিসর কিছুটা রাজকীয় ও সামাজিক রূপ লাভ করেছে। একইভাবে ‘এইটুকু মোর স্থান’ ভাবটি ‘এউটা কুনাকো আসনমা’ —এই বাক্যে রূপান্তরিত হয়ে বিনয়ের অনুভূতিকে আরও দৃশ্যমান ও স্থানিক করে তুলেছে। রবীন্দ্র-কবিতার আধ্যাত্মিক বিনয় নেপালি ভাষার সাংস্কৃতিক পরিসরে নতুনভাবে পুনর্গঠিত হয়েছে।

৮. বাংলা

“তুমি যখন গান গাইতে বল
গর্ব আমার ভরে ওঠে বুক,
দুই আঁখি মোর করে ছলছল
নিমেষহারা চেয়ে তোমার মুখে।” (৭৮ নম্বর)

নেপালি

“জব তিমী মলাঙ্গি গাউন আদেশ দিন্ছৌ, যস্তো লাগ্ছ, মেরো
হৃদয় গর্বলে রিদির্গ হুন্ছ; র ম তিমো মুহারতর্ফ হেছু অনি মেরা
নয়ন রসাউছ্ন্।” (২ নম্বর)

রবীন্দ্রনাথ গায়ক-ভক্তের অন্তর্গত আবেগ, গর্ব ও আত্মবিস্ময়ের মুহূর্তকে অত্যন্ত সংযত ও কাব্যিক ভাষায় প্রকাশ করেছেন। মূল বাংলা পাঠে ‘তুমি যখন গান গাইতে বল’ —এই পঙ্ক্তিতে নির্দেশ নয়, বরং এক অন্তরঙ্গ আত্মবিশ্বাসের ইঙ্গিত রয়েছে। ‘গর্ব আমার ভরে ওঠে বুক’ বাক্যে আত্মসম্মান ও কৃতার্থতার অনুভব প্রকাশ পায়, আর ‘দুই আঁখি মোর করে ছলছল’ — এই চিত্রকল্পে আবেগঘন মুহূর্তটি সংযত কোমলতায় ধরা দেয়। ‘নিমেষহারা চেয়ে’ কথাটি সম্পূর্ণ মনোনিবেশ ও

আত্মবিস্মরণের প্রতীক। নেপালি অনুবাদে এই আবেগগত কাঠামো বজায় থাকলেও প্রকাশভঙ্গিতে স্পষ্ট রূপান্তর লক্ষণীয়। ‘গান গাইতে বল’ বাক্যটি নেপালিতে ‘গাউন আদেশ দিন্ছৌ’ হিসেবে অনূদিত হওয়ায় অনুরোধের সূক্ষ্মতা কিছুটা কর্তৃত্বপূর্ণ নির্দেশে রূপ নিয়েছে। ফলে ভক্তি ও আত্মনিবেদনের সম্পর্কটি এখানে আরও আনুগত্যমূলক হয়ে ওঠে। বাংলার ‘গর্ব আমার ভরে ওঠে বুকে’ ভাবটি নেপালিতে ‘হৃদয় গর্বলে রিদীর্ণ হুন্ছ’ রূপে অনূদিত হয়ে অধিক তীব্র ও নাটকীয় প্রকাশ পেয়েছে। একইভাবে ‘দুই আঁখি মোর করে ছলছল’ ভাবটি ‘নয়ন রসাউছন্’ দ্বারা সরাসরি অশ্রুবিন্দুর চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। ‘নিমেষহারা চেয়ে’-র অন্তর্নিহিত সংযমী বিস্ময় নেপালিতে অপেক্ষাকৃত প্রত্যক্ষ আবেগে পরিণত হয়েছে।

এই প্রবন্ধে নেপালি ভাষায় গীতাঞ্জলি-র অনূদিত গান ও কবিতাগুলিকে কেন্দ্র করে আলোচনা করা হয়েছে। তবে উল্লেখযোগ্য যে, নেপালি ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনার অনুবাদচর্চা কেবল গীতাঞ্জলি-র মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর উপন্যাস, কবিতা, ছোটগল্প, নাটক, আত্মজীবনী ও প্রবন্ধ— এই সকল সাহিত্যরূপই নেপালি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এই প্রবন্ধের পরিসরের সীমাবদ্ধতার কারণে উক্ত বিষয়গুলির বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে এই প্রবন্ধটিকে আরও সম্প্রসারিত ও পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রকাশ করার ইচ্ছা রইল।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, তপোধীর, প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা- ৭০০০০৯, তৃতীয় সংস্করণ : ২০০৬, পৃ. ১৪৪
২. <https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/15302> ১৫/১০/২০
৩. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় কলকাতা, পরিবর্ধিত সংস্করণ : ১৩৫৫, পৃ. ২২৭
৪. তদেব, পৃ. ২৯৫
৫. তদেব
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র-৫, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা-১৭, পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ : ১৪০০, পৃ. ৩৯-৪০
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব (অনুবাদক), কুমার প্রধান, নেপালি সাহিত্যের ইতিহাস, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি ১১০০১, পৃ. ৭৫
৮. ঘোষ, আনন্দগোপাল, রবীন্দ্রনাথ : প্রসঙ্গ নেপালী সাহিত্য-সমাজ ও উত্তরবঙ্গ, সাহিত্য ভগ্নরীথ প্রকাশনী কোচবিহার- ৭৩৬১৪৬, প্রথম প্রকাশ : ১৪১৭, পৃ. ১৫
৯. Indra Vilas Adhikary, department of English, University of North Bengal, 1984, p. 101
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী (পঞ্চবিংশ খণ্ড), বিশ্বভারতী কলকাতা, প্রকাশ : ১৩৫৫, পৃ. ৭৪
১১. তদেব, পৃ. ৭৪-৭৫

Bibliography:

আকরগ্রন্থ

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতাঞ্জলি, সাহিত্যম কলকাতা- ৭০০০০৯, প্রকাশ কাল : ২০১০
রমেশ ভট্ট ও পশুপতি নেউপানে (অনুবাদক), গীতাঞ্জলি, নিরাল প্রকাশনী দিল্লি- ১১০০০২, দ্বিতীয় সংস্করণ : ২০০৭